সংবাদ
03 MAY 2008

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সিস্টেমে সংস্কার প্রয়োজন

ফাহমিদা রহমান

সিরাজগঞ্জ জেলার ত্রিশোর্ধ্ব রাশেদা খাতুনের এসএসসি পরীক্ষার পরপরই বিয়ে হয়। পরিবারের নানামুখী চাপের কারণে পরে তিনি আর পড়ালেখা করতে পারেননি। বর্তমানে তিনি স্থানীয় একটি এনজিওতে কর্মরত। কিন্তু শুধু এসএসসি পাসের সার্টিফিকেট দিয়ে তার কোন ধরনের পদোন্নতি হচ্ছিল না। পরে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ পদ্ধতির বহুমুখী সুবিধার কথা শুনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এইচএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি হন। কিন্তু ভর্তির পরপরই নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন যথাসময়ে পাঠসামগ্রী হাতে না পাওয়া; ঠিক সময়ে পরীক্ষা না হওয়া, ফলাফল প্রকাশে অনেক সময় নেয়া, টিউটোরিয়াল সেন্টারগুলোর ক্লাস সময়মতো না হওয়া। অন্যদিকে কোর্স ফি তুলনামূলক অনেক বেশি যা তার মতো গরিব মানুষের পক্ষে বহন করা কষ্টকর। তার মতে, এ কোর্সে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের বেশিরভাগই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের। তাই কর্তৃপক্ষের উচিত কোর্স ফি কমানো।

অন্যদিকে পাবনা জেলার একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক আমানুল্লা খান। তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে বর্তমানে এমএড করছেন। তিনি বললেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যথাসময়ে পরীক্ষা না হওয়া। ১৯৯৭ সালে তিনি যখন কেন্দ্রীয় কোর্স শুরু করেন তখন ২ বছরের এই কোর্স শেষ হতে সময় লাগে ৫ বছর। আবার প্রতিটি সেমিস্টারে ৬ মাসের কথা বলা হলেও পরীক্ষা হতে ৯ থেকে দশ ১০ মাস লাগে। তার মতে, এখানে ফলাফল প্রকাশ হতেও অনেক দেরি হয় ও প্রতিবারই ফলাফলে ব্যাপক ভুল-ভ্রান্তি থাকে।

প্রতি বছরই আমাদের যুব সমাজের একটা বড় অংশ বিভিন্ন কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ থাকার পরও তারা নিয়মিত লেখাপড়া করার সুযোগ পান না। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত আগ্রহী জনগোষ্ঠীকে সহজেই শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেয়া, উচ্চ শিক্ষা বিস্তার ও বিশেষভাবে কর্মজীবীদের দক্ষতা ও উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৯৮৩ সালে সরকারের কাছে সুপারিশ করে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। এই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯২ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক অনুদানসহ মোট ১৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে গাজীপুরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে এখন ভর্তি হচ্ছেন নানা পেশা ও শ্রেণীর লোক। অল্প বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে তারা যেমন আছেন, তেমনি আছেন চাকরিরত শিক্ষার্থীরাও। পেশায় উন্নতি করার জন্য যাদের ডিগ্রি দরকার তারাও এসে ভর্তি হচ্ছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে বলা হয়েছে দেশের যে কোন স্থানের, যে কোন বয়সের নারী-পুরুষ সুবিধামতো ও প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষা লাভ করতে পারবেন।

যে কোন রকমের যোগাযোগ বা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় বিশেষ করে সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সুযোগ পৌঁছে দেয়াই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য এখানে রয়েছে ৭টি ফ্যাকাল্টি, সারাদেশে ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০টি কো-অর্ডিনেটিং অফিস ও প্রায় ১০৪৫টি টিউটোরিয়াল সেন্টার। এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় ২১টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম চালু করেছে।

মূলত দেশের ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগ তৈরি করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিবাচক কিছু দিতে পারেনি এটি। অন্যদিকে এর শিক্ষার মান ক্রমেই নিম্নগামী হচ্ছে। প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০৯২৬৪ জন। ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে ৭টি অনুষদের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৩৭৪৮৯ জন। ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ৬টি অনুষদে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২০১৭৪১ জনে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান বোর্ড থেকে প্রদত্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানের পর্যায়ে আসতে পারছে না।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বললেন, এখানে শিক্ষার মানের গতি নিম্নমুখী হওয়ার কারণ হলো নিম্নমানের পাঠসামগ্রী, যথাসময়ে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠসামগ্রী না পৌঁছানো, সঠিক সময়ে পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ না হওয়া। অযোগ্য ব্যক্তিদের প্রশাসনে নিয়োগ প্রদান এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব। নানামুখী দুর্নীতির কারণে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত এসব প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তো বৃদ্ধি পায়নি বরং তা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান নির্ভর করবে বেশকিছু বিষয়ের ওপর। যেমন- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ, সঠিকভাবে প্রোগ্রাম পরিচালনা, শিক্ষকদের দক্ষতা, মান উন্নয়ন ও প্রোগ্রাম মূল্যায়ন।

ওই শিক্ষক আরও বললেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি ফ্যাকাল্টিতেই বানানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। ফলে এক ধরনের সামঞ্জস্যহীনতা তৈরি হয়। বইগুলোর পাঠ্যক্রমের বিন্যাস, বিশেষ করে পাঠের বিভাজন ও কলেবর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা উচিত।

আরেক কর্মকর্তাও নাম না জানানোর শর্তে বললেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি হলো দূরশিক্ষণ ভিত্তিক। অর্থাৎ নতুন নতুন প্রযুক্তি যেমন রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হবে। তাই এর পরিচালনে দরকার প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, দক্ষ ও সৎ শিক্ষক-কর্মচারী। কিন্তু এখানে প্রযুক্তিগত কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা খুবই দুর্বল। রাজনৈতিক বিবেচনায়, আঞ্চলিক স্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থ প্রভৃতির ভিত্তিতে লোক নিয়োগ দেয়া হয়। তাছাড়া এখানে শিক্ষক নিয়োগে নীতিমালা থাকলেও তার প্রয়োগ নেই অর্থাৎ যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। এছাড়া এখানে অধিকাংশ প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রেগুলেশনও নেই।

তিনি আরও বললেন, টিউটোরিয়াল সেন্টারের মান ও শিক্ষকদের শিক্ষা দানের সম্পর্কে জানতে ওই সেন্টারের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ ব্যাপারে তিনি টিউটোরিয়াল সেন্টারের রেটিংয়ের কথা বললেন। অর্থাৎ [illegible] প্রতিষ্ঠান দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং খারাপ করলে তা বাতিল করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাছাড়া কখনও কখনও কোন এলাকার একটি টিউটোরিয়াল সেন্টার ওই এলাকার সবচেয়ে ভাল কোন প্রতিষ্ঠানকে না দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা দেয়ার মানও খুবই খারাপ হচ্ছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রেডিও, টিভিতে যে সময় অনুষ্ঠান প্রচার করছে সে সময় শিক্ষার্থীরা অন্য অনুষ্ঠান দেখছে না। এছাড়া বিটিভিতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের সময় অত্যন্ত কম এবং অনুষ্ঠানের মানও ভাল না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া অভ্যন্তরীণ যে প্রোগ্রামগুলো হয় তা যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূল্যায়িত না হওয়ায় এর মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানগুলো পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অডিও ক্যাসেটগুলো মানসম্মত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তদারকির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকার রিজিওনাল ডিরেক্টর হাফিজ আহমেদ বললেন, এখানকার বইগুলো অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ড ফলে শিক্ষার্থীরা এর সঙ্গে খাপখাওয়াতে পারছে না। যারা এসব বই রচনার সঙ্গে জড়িত তাদের উচিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশে তাদের ধরন বুঝে বইগুলো রচনা করা। অর্থাৎ এ ব্যাপারে বারবার মনিটরিং হওয়া দরকার। বর্তমানে পরীক্ষা সঠিক সময়ে নেয়া হচ্ছে ও দ্রুত ফল প্রকাশের ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের সময় নষ্ট না হওয়ার ব্যাপারে বর্তমান প্রশাসন খুব সচেতন।

তিনি এখানকার পড়ালেখার মান আরও গতিশীল করতে একটি নতুন প্রোগ্রাম চালু করার কথা বললেন যার প্রয়োগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনায় আছে। এর নাম ইন্টার একটিভ প্রোগ্রাম। এই ব্যবস্থায় শিক্ষাসামগ্রী হিসেবে বই ও ক্যাসেটের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোবাইল ফোন দেয়া হবে যাতে এসএমএসের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা হবে। তিনি বললেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত আধুনিক করতে বিটিভির প্রোগ্রামের সময়সূচিকে আরও বাড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এছাড়া ফলাফল, মার্কসিট সার্টিফিকেট পেতে যেন গাজীপুর না গিয়ে স্থানীয় অফিস থেকে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বোপরি সেবার মান আরও যুগোপযোগী ও গতিশীল করার প্রচেষ্টা চলছে এবং এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরও সামগ্রিক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আরও এক শিক্ষক বললেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় এক্টের সবচেয়ে খারাপ দিক হলো ভাইস চ্যান্সেলরকে অতিমাত্রায় ক্ষমতা প্রদান। এখানে সিনেট না থাকায় এর অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। এছাড়া নির্বাচনের কোন সুযোগ না থাকায় এখানে বোর্ড অফ গভর্নন্যান্সের অভ্যন্তরীণ সদস্য ও ৭ অনুষদের ডিন ভিসির সুপারিশে মনোনীত হন। [illegible] দেন। অর্থাৎ এখানে ভিসিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। গত ভিসি এরশাদুল বারী এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে অনেক বেশি স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন এবং নিজের দলের অযোগ্য লোকদের এখানে নিয়োগ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বললেন, আগের ভিসির ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয়েছে যার ভিত্তিতে তাকে তুলে নেয়া হয়েছে। এখন নতুন ভিসির অধীনে কাজ ভালভাবে চলবে বলে তিনি আশা করছেন। তবে ভালভাবে কাজ করার জন্য আরও টেকনিক্যাল লোক দরকার বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বললেন, প্রফেসর বারীর অধীনে এখানকার কার্যক্রম অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এছাড়া প্রতিষ্ঠার পর গত ১৫ বছরে এর কার্যক্রম আসলেই অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। এখানকার মিডিয়া সেন্টার তার ক্ষমতার মাত্র ২০ শতাংশ কাজ করে। এছাড়া দূরশিক্ষণ শিক্ষার জন্য যে রিজিওনাল সেন্টারগুলোও খুব দুর্বল। তবে তিনি আশা করেন নতুন ভিসি এটিকে একটি গতিশীল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করবেন। তিনি বললেন, এখানকার ভৌত অবকাঠামো অনেক ভাল। অনেক বড় মিডিয়া সেন্টার আছে। কিন্তু শুধু নেতৃত্বের অভাব ও প্রশাসনিক অবকাঠামো শক্তিশালী না থাকার কারণে সে তুলনায় সেবা দিতে পারছে না। এখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও দূরশিক্ষণ শিক্ষা দিচ্ছে কিন্তু একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাক মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ থেকে এটাই চাওয়া।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও বেশি গতিশীল করার ব্যাপারে শিক্ষাবিদ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বললেন, এটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাই সরকারি উদ্যোগে নিম্নমানের শিক্ষাদান গ্রহণযোগ্য না। তাই ধারাবাহিকভাবে এর মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আর এ মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা দরকার যেখানে শুধু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাড়াও বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এবং শিক্ষাবিদরা থাকবেন।

তিনি আরও বললেন, দূরশিক্ষণ খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটা তৈরি হয়েছে আকস্মিকভাবে। অবকাঠামো ছাড়া তড়িঘড়ি করে বিদেশী সাহায্য নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তাই এর প্রধান দুর্বলতাই হলো পরিকল্পনাহীন অবকাঠামো এবং বেশিরভাগ রিজিওনাল সেন্টারের অযোগ্য শিক্ষক। যারা শিক্ষা দেবেন তাদের অভিজ্ঞতা নেই, এমনকি তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও নেই। এই ধরনের শিক্ষা ক্লাসরুম শিক্ষার চেয়ে কঠিন। কারণ যারা এখানে শিক্ষা নিতে আসছে তারা সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী না। তাই তাদের মনোযোগ ধরে রাখা কষ্টকর। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে এমন অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হবে। এখানে দ্বিতীয় মানের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা ও বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে। ফলে এটি শুধু একটি প্রজেক্ট হিসেবে গড়ে উঠেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যকরী করার জন্য পাঠ্যপুস্তককে মানসম্মত করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সফলতা আনতে একে অবশ্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের পর্যায়ে আনতে হবে।

তিনি বললেন, ইংল্যান্ডে এই পদ্ধতি চালু আছে। তাদের পাঠ্যপুস্তক অনেক উন্নত মানের। তারা সেখানে ৩টি পর্যায়ে লেখাপড়ার সামগ্রী পেয়ে থাকে। প্রথমত রেডিও ও টিভি, দ্বিতীয়ত মুদ্রণ ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ত ক্লাসরুম। তাই আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করতে রেডিও, টিভি, মুদ্রণ ব্যবস্থাও ক্লাসরুমে শিক্ষা উচ্চ পর্যায়ের হওয়া উচিত।